

মানবজাতি কিভাবে এসেছে

প্রথমেই, আমি চীনের নববর্ষ উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই!

নববর্ষ সাধারণত কিছু আনন্দের কথা ভাগ করার সময়। কিন্তু আমি দেখতে পারছি আসন্ন বিপদ মানবজাতির সামনে এগিয়ে আসছে। এই কারণে, ঐশ্বরিক সত্তারা আমাকে কয়েকটি কথা বলেছিলেন যা তাঁরা পৃথিবীর সমস্ত জীবদের বলতে চান। আমি যা প্রকাশ করতে যাচ্ছি সবই স্বর্গীয় গোপন তথ্য, যাতে মানুষ সত্যটা জানতে পারে, এবং মানুষের উদ্ধারের জন্যে আরেকটি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন হল মানবজাতি কিভাবে এসেছে। এই বিশ্বকে এর সৃষ্টি হওয়া থেকে শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের নির্মাণ, স্থিতাবস্থা, অবক্ষয় এবং ধ্বংস এই চারটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যখন ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন যে বিশ্বে আমরা জীবনযাপন করি, সেই বিশ্ব সমেত মহাজগতের সমস্ত কিছু তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং সমস্ত জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে!

যখন একজন মানুষের মৃত্যু হয় তখন শুধুমাত্র তার ভৌতিক শরীরের অবক্ষয় হয় এবং ধ্বংস হয়, তখন তার প্রকৃত আত্মার (সত্যিকারের যে আমি, তার মৃত্যু হয় না) পরবর্তী জীবনে পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং এই বিশ্ব যেভাবে নির্মাণ, স্থিতাবস্থা, অবক্ষয় এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যায়, তেমনি মানুষও জন্ম, বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যায়, এটাই বিশ্বের নিয়ম। এমনকি ঐশ্বরিক সত্তাদেরও এই প্রক্রিয়া আছে, কেবলমাত্র সময়কালটা দীর্ঘ হয়, আরও মহান ঐশ্বরিক সত্তাদের ক্ষেত্রে সময়কালটা আরও দীর্ঘ হয়। তাঁদের জীবন এবং মৃত্যু যন্ত্রণাদায়কও নয়, এবং তারা এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে সচেতন থাকে - তাদের কাছে এটা বাইরের পোশাক পরিবর্তনের মতো। অন্যদিক দিয়ে বলা যায় যে, সাধারণত কোনো জীবনের সত্যি সত্যিই মৃত্যু হয় না। কিন্তু যখন বিশ্ব এবং মহাজগৎ নির্মাণ-স্থিতাবস্থা-অবক্ষয়-ধ্বংস প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, জীবনদের পুনর্জন্ম হয় না, কোনো জীবন বা বস্তুর আর অস্তিত্ব থাকে না, সবকিছুই ধুলোয় পরিণত হয়, সেখানে বিরাজ করে শুধু শূন্যতা। বর্তমানে মানবজগৎ বিশ্বের নির্মাণ, স্থিতাবস্থা, অবক্ষয়, এবং ধ্বংসের মধ্যে (ধ্বংস পর্বের) শেষ সময়কাল অনুভব করছে। এই শেষ সময়ে সবকিছু রূপান্তরিত হয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণেই ধ্বংস আসন্ন। আর এই কারণেই সমাজ এত অস্থির। ভালো চিন্তা বিরল, মানুষের মন পঁচালো হয়ে গেছে, অশ্লীলতা এবং মাদকের অপব্যবহার প্রবল, নাস্তিকতা

এবং অরাজকতা লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের শেষ পর্যায়ে এগুলি অনিবার্য, সঠিকভাবে বলা যায়, আমরা ঠিক সেই সময়টাতেই পৌঁছে গেছি!

বিশ্বের স্রষ্টা সমস্ত ঐশ্বরিক সত্তাদের, সব ভালো ও দয়ালু জীবনদের, এবং মহাজগতের সমস্ত গৌরবময় সৃষ্টিকে লালন করেন। তাই অধঃপতন পর্যায়ের প্রারম্ভে তিনি মহাজগতের সবথেকে বাইরের স্তরে (সাধারণত "যা ঐশ্বরিক জগতের বাইরে" নামে পরিচিত) কিছু ঐশ্বরিক সত্তাদের পরিচালিত করে এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে কোনো ঐশ্বরিক সত্তা নেই। কিন্তু পৃথিবীর স্বাধীনভাবে অস্তিত্বের কোনো উপায় ছিল না; এর জন্যে একটি অনুরূপ জাগতিক কাঠামোর প্রয়োজন ছিল যা জীবন এবং পদার্থের সংবহনের জন্যে একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে। এই কারণে, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বাইরে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, যেটিকে ঐশ্বরিক সত্তারা "ত্রিলোক" বলেন। উদ্ধারের চূড়ান্ত সময় আসার আগে, স্রষ্টার অনুমতি ব্যতীত এই ক্ষেত্রে কোনো ঐশ্বরিক সত্তাকেও, তিনি যত বড়োই হোন না কেন, প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। ত্রিলোকের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান জগৎ রয়েছে: আকাশ্কার জগৎ (*yu*), পৃথিবীর মানবজাতি সহ সমস্ত জীবনদের নিয়ে গঠিত; আকাশ্কার জগতের উপরে আছে দ্বিতীয় ক্ষেত্র, পছন্দের জগৎ (*se*); এর একটি স্তর উপরে আছে তৃতীয় ক্ষেত্র যা পছন্দ ছাড়া জগৎ নামে পরিচিত (*wu se*)। নিচের জগতের থেকে উপরের জগৎ উন্নত এবং আরও মহিমান্বিত, যদিও কোনোটাই ঐশ্বরিক জগৎ বা উচ্চতর অনেক স্বর্গীয় জগতের সাথে তুলনীয় নয়। লোকেরা সাধারণত যে "স্বর্গ"-এর উল্লেখ করে সেটা আসলে ত্রিলোকের মধ্যে অবস্থিত পছন্দের জগৎ বা পছন্দ ছাড়া জগৎ। তিনটি জগতের প্রত্যেকটির মধ্যে দশটি করে স্বর্গীয় স্তর রয়েছে, যদি তিনটি জগৎকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে মোট তেত্রিশটি স্বর্গীয় স্তর হয়। মানুষ জীবনযাপন করে আকাশ্কার জগতে, যা সবথেকে নিচু স্তর এবং এর পরিবেশও সবচেয়ে খারাপ। জীবন এখানে যন্ত্রণাদায়ক এবং সংক্ষিপ্ত, তবে আরও ভয়ঙ্কর সত্য এই যে মানব জগতে লোকেরা সঠিক নীতি মেনে চলে না। মানুষ যেটাকে সত্য মনে করে তা এই বিশ্বে সম্পূর্ণ বিপরীত হিসাবে বিবেচিত হয় (কিন্তু একটি ব্যতিক্রম হল উচ্চতর সত্য যা ঐশ্বরিক সত্তারা মানুষকে শিখিয়েছেন)। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধে যে বিজয়ী হয় সে শাসক হয়, সামরিক শক্তির দ্বারা অঞ্চল দখল করা বা ক্ষমতাবানকে বীর হিসেবে দেখা, এগুলো ঐশ্বরিক সত্তাদের চোখে সঠিক নয়, যেহেতু হত্যা করা হচ্ছে এবং জোর করে অন্যের থেকে কিছু নেওয়া হচ্ছে। এটি বিশ্বের বা ঐশ্বরিক সত্তাদের পথ নয়, তবুও মানব জগতে এসব অনিবার্য, এবং ঠিক মনে করা হয়। এসব মানব জগতের নীতি, কিন্তু সেগুলি বিশ্বের নীতির বিপরীত। সুতরাং, যদি একজন ব্যক্তি স্বর্গে ফিরে যেতে চায় তবে তাকে অবশ্যই সত্যের পথে সাধনা করতে হবে এবং নিজের উপরে কাজ করতে হবে। কোনো লোক যখন অন্যদের চেয়ে কিছুটা ভালোভাবে জীবনযাপন করে, সে খুব ভালো বোধ করে, এখানে লোকটি শুধুমাত্র এই মানব

জগতের মধ্যে অন্য মানুষের সাথে তুলনা করছে, অথচ এখানে প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে মহাজগতের আবর্জনার মধ্যে বসবাস করছে। মহাজগতের সবথেকে বাইরের স্তরে ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এর ভিতরে আছে অণু পরমাণু ইত্যাদি সবথেকে নিম্নমানের, অশোধিত ও সবথেকে নোংরা কণা, যা দিয়ে এটা গঠিত। ঐশ্বরিক সত্তাদের দৃষ্টিতে এটাই বিশ্বের আবর্জনা ফেলার জায়গা। এইভাবে তাঁরা এখানকার অণুর স্তরের কণাগুলিকে ধুলো বা "কাদামাটি" হিসাবে বিবেচনা করে এবং এটিকে সবচেয়ে নিচু স্থান হিসাবে দেখে। কিছু ধর্মও মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরকম বলা হয়েছে যে ঐশ্বর কাদামাটি দিয়ে মানুষ তৈরি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অনু দিয়ে গঠিত এই স্তরের পদার্থ থেকেই মানুষ তৈরি হয়েছিল।

যখন ঐশ্বরিক সত্তারা মানুষকে তৈরি করেছিলেন, তখন তাঁরা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে তা করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের প্রত্যেককে নিজস্ব স্বতন্ত্র চেহারা অনুযায়ী মানুষ তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই কারণে শ্বেতবর্ণের মানুষ, পীতবর্ণের মানুষ, কালোবর্ণের মানুষ, ইত্যাদি নানান ধরনের জাতি রয়েছে। যদিও তাদের বাহ্যিক চেহারা ভিন্ন, তাদের মধ্যকার আত্মা সৃষ্টিকর্তা দ্বারা প্রদত্ত ছিল, আর এ কারণেই তাদের একটা সাধারণ মূল্যবোধ রয়েছে। মানুষ তৈরি করার জন্যে সৃষ্টিকর্তা ঐশ্বরিক সত্তাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটার উদ্দেশ্য ছিল যাতে শেষ সময়ে মানুষকে ব্যবহার করে সব ঐশ্বরিক সত্তা সহ বৃহত্তর মহাবিশ্বের সমস্ত জীবনদের মুক্তি প্রদান করা যায়।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ঐশ্বরিক সত্তাদের দিয়ে কেন এমন নিচু ও নিকৃষ্ট স্থানে মানুষ সৃষ্টি করলেন? এর কারণ হচ্ছে, এটি মহাবিশ্বের সর্বনিম্ন স্তর, এটি সবচেয়ে কষ্টকর জায়গা, কষ্ট হলে তবেই একজন ব্যক্তি নিজেকে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত করতে পারবে এবং কষ্ট করলে তখনই তার পাপ কর্মের ফল দূর হবে। যখন কোনো ব্যক্তি এত কষ্টের মধ্যেও, করুণাপূর্ণ হৃদয় বজায় রাখতে পারবে, কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ করতে পারবে এবং একজন ভালো মানুষ হতে পারবে, তখনই সে নিজেকে উন্নত করতে পারবে। এছাড়া মুক্তিলাভ হচ্ছে নিম্ন থেকে উচ্চে আরোহণের একটি প্রক্রিয়া, সেইজন্যে একজন ব্যক্তিকে সবথেকে নিচু জায়গা থেকেই শুরু করতে হবে। এখানে জীবনযাপন করা যে কোনো লোকের পক্ষেই কষ্টকর, লোকেদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে, প্রাকৃতিক পরিবেশ ভয়ানক, মানুষকে বেঁচে থাকার জন্যে অনেক চিন্তাভাবনা এবং কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদি করতে হয়। এই সমস্ত পরিস্থিতি মানুষকে উন্নত করতে থাকে এবং তার কর্মফল দূর করার সুযোগ দেয়। দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে গেলে মানুষ তার পাপ কর্মের ফল দূর করতে পারে, এটা নিশ্চিত। এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালো স্বভাব বজায় রাখতে পারে, তার সদগুণের সঞ্চয় হতে থাকে, ফলস্বরূপ তার আত্মার উন্নতি হতে থাকে।

বর্তমান সময়ের আগমনের সাথে সাথে সৃষ্টিকর্তা মূলত মানবদেহকে ব্যবহার করে মহাবিশ্বের বহু জীবনদের বাঁচাতে চেয়েছেন। বেশিরভাগ মানবদেহের আদি জীবনগুলিকে দেবতারা মানুষ হিসাবে পুনর্জন্ম নিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন। কারণ মানবদেহ কষ্ট সহ্য করে পাপ কর্মের ফল দূর করতে পারে, একই সাথে এই সত্য বর্জিত স্থানে, ঈশ্বরের শেখানো উচ্চতর সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, এবং ভালো মানসিকতা ও করুণাভাব বজায় রেখে মানব জীবনের উন্নতি ঘটতে পারে। অন্তিম সময় ইতিমধ্যে এসে গেছে, ত্রিলোকের বাইরে স্বর্গে প্রবেশ করার দরজা খোলা হয়েছে, এবং বিশ্বের স্রষ্টা ইতিমধ্যেই এই ধরণের লোকদের উদ্ধারের জন্যে বেছে নিচ্ছেন।

মহাবিশ্বের সবকিছুই নির্মাণ, স্থিতাবস্থা এবং অবক্ষয়ের পর্যায়গুলিতে অশুদ্ধ হয়ে গেছে, কোনো কিছুই প্রারম্ভিক সময়ের মতো ভালো নেই, আর এই কারণেই জিনিসগুলো ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ বলা যায় যে, বৃহত্তর মহাবিশ্বের সবকিছুই খারাপ হয়ে গেছে, সব জীবগুলি আর প্রারম্ভিক সময়ের মতো ভালো নেই, জীবনগুলিও আর বিশুদ্ধ নেই, তাদের সকলেরই পাপ কর্ম জমা হচ্ছে, এবং এই কারণেই বিনাশ আসছে। এই ধরনের পাপকে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে আদি পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাবিশ্বকে রক্ষা করার জন্যে, সৃষ্টিকর্তা বহু ঐশ্বরিক সত্তাদের এবং দেবতাদের পৃথিবীতে অবতরণ করতে এবং এই পরিস্থিতিতে মানুষের রূপ ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে তাঁরা দুঃখভোগ করবেন, নিজেদের উন্নত করবেন, তাঁদের পাপ দূর করবেন এবং নতুন করে নিজেদের তৈরি করবেন, এর ফলে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যাবেন। (যেহেতু সৃষ্টিকর্তা মানবজাতিকে উদ্ধারের সাথে সাথে বিশ্বকে নতুনভাবে নির্মাণ করবেন) নতুন বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ এবং খুবই সুন্দর। যদি এইরকম দুর্ভোগজনক পরিস্থিতির মধ্যে, একজন ব্যক্তি এখনও ভালো চিন্তা ধরে রাখতে পারে, যদি আধুনিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির আক্রমণের বিরুদ্ধে সে ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণা ধরে রাখতে পারে, যদি সে এখনও নাস্তিকতা এবং বিবর্তনবাদী শিবিরের আক্রমণের মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে, তবেই সেই ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করবে এবং স্বর্গে ফিরে যাওয়ার লক্ষ্য পূরণ করবে। পৃথিবীতে এখন যে সমস্ত উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে, সেগুলি চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্যে ঐশ্বরিক সত্তারা পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল এখানে জীবনদের পরীক্ষা করে দেখা যে তাদের উদ্ধার করা যাবে কি যাবে না, এবং একই সাথে দুর্ভোগের প্রক্রিয়ার মধ্যে পাপ কর্মের ফল দূর করা। এই সবই করা হয়েছিল যাতে মানুষকে উদ্ধার করা যায় এবং সে স্বর্গে ফিরে যেতে পারে।

অর্থাৎ এইভাবে বলা যায় যে এই পৃথিবীতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সমাজে কোনো কিছু অর্জন করা নয়। এর জন্যে লোকেরা মানবজীবনে তীব্র প্রচেষ্টা এবং সংগ্রাম করে, এমনকি নীতিহীন উপায় অবলম্বন করে কিছু প্রাপ্ত করে, এটা শুধু মানুষকে খারাপ করে দেয়। মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে আসার কারণ হচ্ছে তাদের পাপ কর্মের ফল দূর করা এবং সাধনায়

নিজের উন্নতিলাভ করাটাই লক্ষ্য। মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে মোক্ষ লাভের জন্যে, অপেক্ষা করছিল যাতে সৃষ্টিকর্তা তাদের স্বর্গলোকে ফিরিয়ে নিতে পারেন, সেইজন্যেই তারা মানব রূপ ধারণ করেছিল। যখন তারা অপেক্ষা করছিল, তাদের অতীতের অনেক জীবনগুলিতে সদগুণ সঞ্চিত হয়েছিল; এবং এটাই ছিল মানুষের পুনর্জন্মের উদ্দেশ্য। এই বিশ্বের সমস্যা-সংকুল প্রকৃতির অর্থ এই জীবনগুলিতে মহৎ কিছু করা। অবশ্যই, কিছু লোক আছে যারা, দুর্ভোগের সম্মুখীন হলে ঐশ্বরিক সাহায্য চায়, ফলাফলে সন্তুষ্ট না হলে ঐশ্বরকে ঘৃণা করতে শুরু করে—এমনকি ফলস্বরূপ ঐশ্বরের বিরুদ্ধে ঘুরে যায়। কেউ কেউ এমনকি আসুরিক পথ গ্রহণ করে, এবং নতুন পাপ কর্ম সৃষ্টি করে। এই লোকেরা দ্রুত ফিরে এসে ঐশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক, যাতে তারা নিরাপদে ফিরে আসতে পারে। একজন ব্যক্তির জীবনে যা কিছু ঘটে – তা উচিৎ মনে হোক বা না হোক – বাস্তবে, সবই হচ্ছে কর্মফল, যা অতীত জীবনে ভালো কাজ করা বা খারাপ কাজ করার ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতীত জীবনের সঞ্চিত হওয়া আশীর্বাদ এবং সদগুণের পরিমাণ নির্ধারণ করে এই জীবনের অথবা সম্ভবত পরবর্তী জীবনের ভাগ্য। যদি কোনো ব্যক্তির এই জীবনে আশীর্বাদ এবং সদগুণ অনেক থাকে সম্ভবত পরবর্তী জীবনে এই আশীর্বাদ এবং সদগুণের বিনিময়ের মাধ্যমে সে একটি উচ্চ পদের আধিকারিক হবে এবং উচ্চ বেতন প্রাপ্ত হবে, অথবা এগুলো বিভিন্ন ধরনের সম্পদ এবং সৌভাগ্যে রূপান্তরিত হতে থাকবে। কোনো ব্যক্তি সুখী পরিবার পাবে কি না, এমনকি কারোর সন্তানের কী পরিণতি হবে ইত্যাদিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। এই মূল কারণের জন্যেই কিছু লোক ধনী হয় এবং কিছু লোক দরিদ্র হয়, অথবা কেউ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়, এবং কেউ নিঃস্ব ও গৃহহীন হয়। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে সমতা সম্পর্কে অশুভ কমিউনিস্ট পার্টি যে সব উল্টোপাল্টা কথা বলে থাকে এটা সেরকম কিছু নয়। বিশ্ব ন্যায়পরায়ণ, যে জীবন ভালো কাজ করে সে এরজন্যে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়, আর যে খারাপ কাজ করে তাকে সেটা শোধ করতে হবেই – যদি এই জীবনে শোধ না হয় তবে পরের জীবনে শোধ করতে হবে। এটি বিশ্বের অপরিবর্তনীয় নিয়ম! স্বর্গ, পৃথিবী, দেবতারা এবং সৃষ্টিকর্তা সকলেই সমস্ত জীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল। স্বর্গ, পৃথিবী, মানুষ এবং দেবতারা সবই সৃষ্টিকর্তা তৈরি করেছেন, এবং ব্যাপারটা কখনই এমন নয় যে তিনি কিছু জীবনকে পছন্দ করেন এবং কিছু জীবনকে অপছন্দ করেন। মূলত অতীতের কাজের কর্মফলের কারণেই কিছু লোক সুখে জীবনযাপন করে এবং কিছু লোক দুঃখে থাকে।

তুমি যখন কোনো মানুষকে জীবনে জিততে বা হারতে দেখো, তখন বাস্তবে এটা স্বাভাবিকভাবে ঘটে বলে মনে হয়। কিন্তু এটি মূলত সেইসব লোকদের অতীতের কাজের কর্মফল। তোমার কাছে কিছু আছে বা নেই, তুমি জীবনে জিতেছ বা হেরেছ, এগুলো মানব সমাজের পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই ঘটে থাকে। সুতরাং তুমি এই জীবনে ধনী বা দরিদ্র যাই হও না কেন, তুমি অবশ্যই ভালো কাজ করবে, খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে, ভালো মানুষ ও দয়ালু হবে, আধ্যাত্মিক ও ধর্মপ্রাণ হবে, এবং খুশি মনে অন্যদের সাহায্য করবে। এইভাবে তুমি আশীর্বাদ ও সদগুণ সঞ্চয় করবে, এবং পরবর্তী জীবনে পুরস্কার

প্রাপ্ত হবে। অতীতে চীনের বয়স্ক লোকেরা প্রায়ই বলত, যখন এই জীবন কষ্টকর হবে তখন বিলাপ করবে না, এবং বেশী করে ভালো কাজ করে বেশী করে সদগুণ অর্জন করবে, পরবর্তী জীবন ভালো হবে। অর্থাৎ আগের জীবনে ভালো কাজ না করলে, আশীর্বাদ ও সদগুণ সঞ্চয় হবে না, তখন ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করলেও কাজ হবে না। এই বিশ্বের নিজস্ব নিয়ম রয়েছে, এমনকি দেবতারাও অবশ্যই সেগুলি মেনে চলবেন। দেবতারা যদি এমন কাজ করেন যা তাঁদের করা উচিত নয়, তাহলে দেবতারাও শাস্তি পাবেন। সুতরাং জিনিসগুলোকে মানুষ যেরকম সরল মনে করে সেরকম নয়, তুমি দেবতাদের কাছে যা প্রার্থনা করবে সেটাই তাঁরা তোমাকে দেবে কি? এর জন্যে পূর্বশর্ত হল এই যে তোমাকে বিগত জীবনকালে আশীর্বাদ ও সদগুণ সঞ্চয় করতে হবে, তুমি যা প্রাপ্ত হবে সেটা তোমার আশীর্বাদ এবং সদগুণের বিনিময়ে হবে! কারণ এটা বিশ্বের নিয়ম দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কিন্তু মূলগত ভাবে বলা যায় যে, তুমি যা চাও সেটা অর্জন করাটাই, আশীর্বাদ এবং সদগুণ সঞ্চয় করার মূল উদ্দেশ্য নয়। মানব জীবনে আশীর্বাদ এবং সদগুণ সঞ্চয় করার আসল উদ্দেশ্য হল স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করা, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর এসবের বিনিময়ে মানব জীবনে ঋণিক সময়ের সুখ পাওয়াটা উদ্দেশ্য নয়!

মাস্টার লি হোং জি

20 জানুয়ারী, 2023